ইঁদুর, টাইপ রাইটার এবং ইন্টারনেট

জন মার্টিন, প্রবাসী মনোবিজ্ঞানী

যা না বললেই নয়ঃ

বাংলা সিডনি তে অনেক দিন লেখা হয় না। এর জন্য আমি যত না দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী ফেসবুক। যারা লিখেন তারা জানেন- মাথায় একটা কেমিস্ট্রি যখন কাজ করে ঠিক তখনি লেখার জন্য এক ধরনের প্রসব বেদনা অনুভব করেন সব লেখকই। কিন্তু ফেসবুক এর জন্য সেই প্রসব বেদনা আর আগের মত লম্বা সময় ধরে হয় না। স্ট্যাটাস দিয়ে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায় তার জন্য উসখুস করে অনেকেই। আমি ও মাঝে মাঝে সেই দলে যোগ দেই। কিন্তু ওই স্ট্যাটাস দেয়ার বড় অসুবিধা হচ্ছে – লম্বা স্ট্যাটাস অনেকেই পড়ে না। তাই – অনেক কথা ছোট করতে করতে প্রায় নগ্ন হয়ে যাবার মত অবস্থা। একটা লেখা দিয়ে মনে কেমন জানি একটা অতৃপ্তি আটকে থাকে। আনিস ভাই অনেক বার লেখা দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি বললাম, 'লেখকদের প্রেম নিবেদন না করলে, লেখা বের হয় না'। ওমা এটা বলে মনে হয় ভুল করলাম। বাংলা সিডনি র বেশ কিছু পাঠক কার 'অদৃশ্য ইশারায়' আমাকে প্রেম নিবেদন করা শুরু করল। অতএব এবার লেখা না দিয়ে কি আর উপায় আছে?

একঃ ইঁদুরের গল্পঃ

আমার মেয়ে ঋষিতা। ও এবার সাতে পা দিবে। ওর বেড়ে উঠা আমাকে ব্যস্ত রাখে দিন রাত। আমি জগতের বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। ও আমার বাবাকে দেখেনি। ওর দাদাভাই ওর কাছে কেবলই দেয়ালে লাগান ছবি। আমি প্রায়ই ভাবি, 'আমার বাবা ওর সাথে কি ভাবে খেলত? কি ভাবে কথা বলত?' ও যখন সেই ইঁদুরের ছানার মত ছোট ছিল, আমি ওকে আমার বাবার ছবির সামনে নিয়ে ওকে ওর দাদাভাইয়ের সাথে কথা বলাতাম। সেই থেকে আমাদের এই খেলা শুরু হয়েছিল। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে ঋষিতা দাদাভাইকে 'গুডনাইট' বলে বিছানায় যেত, বাবার নামে অভিযোগ করতে হলে সেই ছবির সামনে গিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলত, ' দাদাভাই, বাবা আমার কথা শুনে না'। দিনে দিনে দেয়ালের ছবিটা আমাদের বাড়িতে একটা জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছিল।

এবার আমি সেই খেলায় নতুন চরিত্র ঢুকালাম ।

ঋষিতাকে বললাম, 'জানো আমার একটা ইঁদুর ছিল। কিন্তু তোমার দাদাভাই সেটা জানত না'।

ঋষিতার চোখ বড় হয়ে যায়, 'ওটা তোমার PET ছিল?' আমি বলি,' হ্যাঁ, ওটা আমার পোষা ইঁদুর'।

তারপর প্রতি রাতে ওকে আমার সেই বানানো ইঁদুরের গল্প বলতে হতো। সেই ইঁদুর কি কি দুষ্টামি করে আমাকে বিপদে ফেলত আর ওর দাদাভাইয়ের চোখ এড়িয়ে আমি কিভাবে ইঁদুরটাকে পুষতাম। গল্প বলার সময় কখন যদি একটু জোরে কিছু বলে ফেলতাম, ঋষিতা সাথে সাথে সাবধান করে দিত। 'বাবা আস্তে আস্তে বল। দাদাভাই তোমার কথা জেনে যাবে'।

ও আবার একটু বেশি সাবধানী হয়ে আগ বাড়িয়ে সেই দেয়ালের ছবিটা পা টিপে টিপে দেখে আসত। তারপর ফিসফিস করে বলত , 'দাদা ভাই ঘুমাচ্ছে। ইঁদুরের কথা শুনে নি'।

আমি ওর কাণ্ড দেখে মাঝে মাঝে চমকে যেতাম। তাই তো? ওতো সত্যি ই ইঁদুরের গল্প বিশ্বাস করছে। কিন্তু আমার প্রাণ ভরে যেত ও যখন ওই ছবিটার সাথে ওর মনের সকল বিশ্বাস দিয়ে কথা বলত। 'আহারে, বাচ্চা আমার! যদি সত্যিই তোমার দাদা ভাইয়ের দেখা পেতে!'

ঋষিটার দাঁত নড়া শুরু হোল। ওর সেকি আনন্দ। ও বড় হচ্ছে। বাড়িতে যে আসে তাকেই সেটা দেখায়। স্কুলে শিখেছে কোন এক 'ফেইরি' মানে পরী এসে নাকি ওর দাঁত নিয়ে যাবে আর ওকে নাকি 'মানি' দিবে। ওর মাকে পটিয়ে পটিয়ে দাঁত রাখার একটা রুপালি বাক্স ও কিনল। ওর সেকি উত্তেজনা।
আমি ওকে বললাম, 'তোমার দাঁত টা যদি ইঁদুরকে দাও তবে ইঁদুর ও তোমাকে সুন্দর একটা দাঁত দিবে'।
উহু ! ও রাজি না।
আমি বললাম , 'আমরা ইঁদুরের গর্ত খুঁজে বের করব তারপর সেই গর্তের সামনে গিয়ে বলবো, ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, আমার দাঁত তুমি নাও- তোমার দাঁত আমাকে দাও'। ঋষিতা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।
'তাহলে ইঁদুরের দাঁত আমার মুখে লেগে যাবে?' ঋষিতার অবাক করা প্রশ্ন।
'হ্যাঁ। তোমার খুব সুন্দর দাঁত হবে'। এবার ঋষিতার বোধহয় একটু সন্দেহ হোল। ও পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তাহলে দাদাভাই তো তোমার ইঁদুরের কথা জেনে যাবে?'
আমার মুখে আর উত্তর নেই। তাইত আমি তো সেটা ভাবিনি? ঋষিতা ঠিক করে ফেলল ওর দাঁত ও ইঁদুরকে দিবে না। ও অপেক্ষা করবে ওর সেই পরীর জন্য। কারণ পরী ওকে 'মানি' দিবে!

দুইঃ টাইপ রাইটারের গল্প

পুরানো জিনিষের উপর আমার আর মৌসুমির ভীষণ নজর। একবার এক দোকানে পেলাম পুরানো এক টাইপ রাইটার। আমি তো কিনার জন্য এক পা এগিয়ে। ঘরে জায়গা নেই আর আমি কিনা ওটা কেনার পায়তারা করছি? কিন্তু ওটা আমাকে কিনতেই হবে। আমি বেশ দাম দিয়েই কিনলাম। আমি আসলে টাইপ রাইটার কিনি নি - আমি কিনেছি আমার ছোট বেলার স্মৃতি। আমাদের একটা টাইপ রাইটার ছিল। বাবা আমার মাস্টার মানুষ ছিল তো তাই ঘরে একটা টাইপ রাইটার শোভা পেত। আমরা কারণে অকারণে সেই টাইপ রাইটার নিয়ে ঠোকাঠুকি করতাম। বাবা কিছু বলত না। এখন বুঝি তখন বাবা কিছু বলত না কেন ! আমার মেজদা সেই টাইপ রাইটার বিক্রি করে একটা রেডিও কিনে নিয়ে এলো। বাবার ভীষণ মন খারাপ। মেজদা রেডিও টা এনে বাবার কাছে দিল। আমরা তখন ছোট। রেডিও পাবার আনন্দ দেখে কে? কিন্তু রেডিওটা সেই যে বাবার কব্জায় গেল – আমাদের কাছে আর এলো না। আমারা অপেক্ষা করতাম বাবা কখন ঘুমাবে! বাবার টাইপ রাইটার বিক্রির দুঃখ কোথায় উড়ে গেল !

টাইপ রাইটার বিক্রির দুঃখ কি শুধু বাবার ছিল? নাকি আমার ও একটু কষ্ট হয়েছিল? নতুবা এই পুরানো টাইপ রাইটার গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনব কেন? আমি তো কিনেই খালাস। কিন্তু ওটা রাখব কোথায়? আমি যতই বলি, ' ঘরের একটা কোনায় রেখে দাও না'? মৌসুমির তাতে ভীষণ আপত্তি। আর এই আপত্তির কারণে সেই টাইপ রাইটার দশ বছর অদৃশ্য হয়ে রইল। কিন্তু এবার যখন আমার পড়ার নিজস্ব ঘর হোল, আমি অবাক হয়ে দেখলাম মৌসুমি খুব যত্ন করে ওটা সাজিয়ে রেখেছে।

ঋষিতা টাইপ রাইটার কখন দেখেনি। প্রথম দিন আমার পড়ার ঘরে ওটা দেখে ও তো অবাক। ‘ বাবা এটা কি? আমার নিউ টয়’?
আমি কি আর ওকে না বলতে পারি? আমার বাবা ও তো আমাকে না বলে নি। আমার পড়ার ঘরে একটা ছোট ছিরকুট আছে।
‘আমি বাড়ি নেই। বাড়ির অন্য সবার সাথে চমৎকার সময় কাটান’। ঋষিতা কি আর সেই কথা শোনে? ও সময়ে অসময়ে আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করে আমার পড়ার ঘরে ঢুকে – যখন খুশি সেই টাইপ রাইটার এ ঠোকাঠুকি করে। আমি জিজ্ঞেস করলে বলে , ‘আমি থিসিস টাইপ করছি’। আমার দম বন্ধ হয়ে হাসি উঠে। আমি আরও আগ্রহ নিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি- ‘এই টাইপ রাইটার টা কেমন’?
‘ভাল না’, ঋষিতার সোজা সাপটা উত্তর।
‘কেন ভাল না’?
‘এটাতে ইন্টারনেট নেই’। এবার আর আমি হাসি থামাতে পারলাম না। হো হো করে হেসে উঠলাম।
ঋষিতা বিরক্ত হয়ে বলল , ‘দিস ইস নট ফানি’।

আসলেই এটা ‘ফানি’ নয়। এটা হচ্ছে ওদের সাথে আমাদের তফাৎ এর নমুনা। ওরা বড় হচ্ছে যে ভাবে আর আমরা ওদের বড় করতে চাই যে ভাবে – তার মধ্যে যে তফাৎ সেটা সেই টাইপ রাইটার আর ইন্টারনেট এর তফাৎ এর মত। অতএব ওদের সাথে তাল মিলাতে হলে আমাকে ও যে টাইপ রাইটার এ ইন্টারনেট লাগাতে হবে !

পুনশ্চঃ এই নভেম্বরে আমার মেয়েটির জন্মদিন। এই এতগুলো বছর ওর জন্মদিনে আমি কেবল একটি কথা ই মনে মনে বলিছি, ‘মাগো, বড় হয়ে বাবা-মাকে ছেড়ে বেশি দূর যাসনে। যতটা পারিস এই আমাদের কাছে কাছেই থাকিস’। এই কথাটি ওকে আবার বলব ও যখন আঠারতে পা দিবে।